بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ৩০ মার্চ ২০১৮, মোতাবেক ৩০ আমান ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রা.)'র পুত্র ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রা.) সেই সাহাবী যার স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটে কয়েক জুমুআ পূর্বে আমি বলেছিলাম, তার শাহাদতের পর মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বল, তোমার বাসনা কি? আমি তা পূর্ণ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমার বাসনা হল, জীবিত হয়ে পুনরায় যেন পৃথিবীতে ফিরে যাই এবং আবার তোমার পথে শাহাদত বরণ করি। এটি যেহেতু খোদার (প্রতিষ্ঠিত) রীতি ও নিয়ম পরিপন্থি, তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি তো সম্ভব নয়। কেননা মৃতদের পুনরায় পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হয় না। (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুত্ তফসীরুল কুরআন, বাব ও মান সূরা আলে ইমরান, হাদীস নং: ৩০১০) এছাড়া যদি অন্য কোন বাসনা থাকে তবে বল। যাহোক, এর মাধ্যমে তার কুরবানীর মান এবং তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুপম ব্যবহারের ধারণা পাওয়া যায়।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) এক অতি মর্যাদাবান সাহাবী পিতার পুত্র ছিলেন। তিনি শৈশবেই আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় বয়আত করেছিলেন। {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯২, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হারাম (রা.) বৈরুতের দারুল ইলমিয়া থেকে ১৯৯৬ সনে প্রাকশিত}

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রা.)'র স্মৃতিচারণে এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তিনি তার পুত্রকে বলেছিলেন, ইহুদীর কাছ থেকে নেয়া আমার যে ঋণ রয়েছে, আমার শাহাদতের পর তা সেই বাগানের ফল বিক্রি করে পরিশোধ করো। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং: ১৩৫১)

নির্দেশ অনুসারে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করেন। এছাড়া সেই যুগে বাগান এবং ফসলের বিপরীতে ঋণ নেয়ারও প্রচলন ছিল। হযরত জাবের (রা.)ও তার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ নিতেন। এ সংক্রান্ত একটি বিশদ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ঋণ পরিশোধের সময় তিনি ইহুদীকে বলেন, বাগান থেকে উপার্জন বা আয় কম হয়েছে অথবা ফলন কম হওয়ার কারণে আয় স্বল্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিছুটা অবকাশ দাও, কিছুটা এখন নাও আর বাদবাকী আগামী বছর নিও। কিন্তু সেই ইহুদী কোন

প্রকার সুযোগ প্রদানে সম্মত ছিল না। এই দুশ্চিন্তা নিয়ে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন বা তিনি (সা.) এ সম্পর্কে অবগত হন। মহানবী (সা.) সেই ইহুদীর কাছে সুপারিশ করেন কিন্তু সে মানে নি। এরপর মহানবী (সা.) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কীভাবে সেই সাহাবীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, দোয়া করেন ফলে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে কৃপা করেন- এর উল্লেখ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। এখানে এটিও বলে দিচ্ছি, অনেকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.)'র পিতার ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি তার পুত্রকে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে নসীহত করেছিলেন। যাহোক, তখন ফলন কম হয়েছিল বলে ঋণ পরিশোধ করা দুষ্কর ছিল। এরপর যেমনটি আমি বলেছি, বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সকাশে পৌঁছে। বুখারী শরীফে যে হাদীস রয়েছে তা থেকে বুঝা যায়, এটি পরবর্তি অন্য কোন সময়ের ঘটনা। যাহোক, বিভিন্ন সাহাবীর প্রতি মহানবী (সা.)-এর স্নেহ এবং তাঁর (সা.) দোয়া গৃহীত হওয়া–সংক্রান্ত নিদর্শন এর মাধ্যমে দেখা যায় তা যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মদীনায় এক ইহুদী বসবাস করত, যে আমার খেজুর বাগানের নতুন ফসল উৎপাদনকে সামনে রেখে আমায় ঋণ দিত। আমার এই জমি 'রোমাহ্' নামক কূপের কাছে অবস্থিত ছিল। একবার বছর পার হয়ে যায় কিন্তু ফলন কম হয় আর পুরোপুরি পাকেও নি। ফল পাকার মৌসুমে সেই ইহুদী রীতি অনুসারে ঋণ ফেরত নেয়ার জন্য উপস্থিত হয় অথচ সে বছর আমি কোন ফসল ঘরে তুলি নি। তিনি (রা.) বলেন, আমি তার কাছে আরো এক বছরের অবকাশ চাই কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানায়। তার দুরভিসন্ধি ছিল, এভাবে হয়ত পুরো বাগানই তার হস্তগত হবে। মহানবী (সা.) এই ঘটনার সংবাদ অবগত হন এবং সাহাবীদের বলেন, চল! জাবেরের জন্য আমরা ইহুদীর কাছে গিয়ে অবকাশ চাই। তিনি (রা.) বলেন. কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তিনি (সা.) আমার বাগানে আসেন এবং ইহুদীর সাথে কথা বলেন কিন্তু মহানবী (সা.) কে সম্বোধন করে সেই ইহুদী বলে, হে আবুল কাশেম! আমি তাকে অবকাশ দিব না। ইহুদীর এই আচরণ দেখে তিনি (সা.) খেজুরের বৃক্ষগুলো একবার প্রদক্ষিণ করেন এবং পুনরায় সেই ইহুদীর সাথে কথা বলেন, কিন্তু সে আবারো অস্বীকৃতি জানায়। তিনি (রা.) বলেন, ইত্যবসরে আমি বাগান থেকে কিছু খেজুর পেড়ে করে এনে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থাপন করলে তিনি তা খান এবং বলেন, জাবের! তোমার কুঁড়ে ঘরটি কোথায়? (বাগানে আরাম করার জন্য ছোট্ট কুঁড়েঘর হয়ে থাকে।) আমি উত্তর দিলে তিনি (সা.) আমাকে বলেন, আমার জন্য সেখানে চাটাই বিছিয়ে দাও যেন আমি কিছুক্ষণ তাতে বিশ্রাম করতে পারি। তিনি বলেন, আমি নির্দেশ পালন করি। তিনি (সা.) সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। জাগ্রত হওয়ার পর আমি পুনরায় মুষ্ঠিভর খেজুর আনি, তিনি (সা.) তা থেকে কয়েকটি খান এবং পুনরায় দণ্ডায়মান হন আর ইহুদীর সাথে আবারো কথা বলেন, কিন্তু সে মানে নি। এরপর

তিনি (সা.) পুনরায় বাগান প্রদক্ষিণ করেন এবং আমাকে বলেন, জাবের! খেজুর গাছ থেকে ফল পাড়তে আরম্ভ কর আর ইহুদীর ঋণ পরিশোধ কর। আমি খেজুর পাড়তে আরম্ভ করি, এ সময় তিনি (সা.) খেজুর বাগানে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমি ফল সংগ্রহ করে ইহুদীর পুরো ঋণ পরিশোধ করি উপরন্তু আরো কিছু খেজুর রয়ে যায়। আমি হুযূর (সা.)-এর সকাশে এই শুভ সংবাদ প্রদান করলে তিনি (সা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আত'ইমাহ্, হাদীস নং: ৫৪৪৩)

এই যে নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে এবং এই যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এর কারণ হল, **'খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেন এবং আমার কাজকে আশিসমণ্ডিত করেন'**। অতএব এতে মহানবী (সা.)-এর স্নেহ এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার কল্যাণে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার দৃষ্টান্ত দেখি আর এর পাশাপাশি ঋণ পরিশোধের জন্য সাহাবীদের মাঝে ব্যাকুলতাও পরিলক্ষিত হয়। অতএব এই প্রেরণাই একজন প্রকৃত মু'মিনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। অনেক সময় এখানকার সমাজে আমাদের চোখে পড়ে যে, আহমদী আখ্যায়িত হয়েও (অনেকেই) এর প্রতি যত্নবান থাকে না এবং ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তালবাহানা করতে থাকে, বছরের পর বছর কেটে যায়, মামলা-মোকদ্দমা চলতে থাকে। কাজেই, আমাদেরও সব সময় স্মরণা রাখা উচিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্য স্মরণ রাখা উচিত যে, **আমার হাতে বয়আত করার পর সাহাবীদের জীবনাদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন কর**, সেগুলো অবলম্বন কর, কেবল তবেই সেই সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যা মসীহ্ ও মাহদী আসার পর প্রতিষ্ঠির হওয়ার কথা ছিল। (মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪১৩)

ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত জাবের (রা.)'র পক্ষ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর পূর্বে একটি ঘটনা শোনাতে চাই। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে যখন এটি জানা যায় যে, ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে তখন হযরত উমর (রা.)ও সেখানে আসেন। হযরত উমরকে সম্বোধন করে মহানবী (সা.) বলেন, একে জিজ্ঞেস কর, কী ঘটেছে? তিনি (রা.) বলেন, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, আপনি যখন বাগানে একবার প্রদক্ষিণ করেন তখনই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এখন তার পুরো ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়বার যখন বাগান প্রদক্ষিণ করেন তখন আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ়তা লাভ করে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইসতেকরায, হাদীস নং: ২৩৯৬)

যেমনটি আমি বলেছি, ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত জাবের (রা.)'র বরাতে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে, একজন সাহাবীর দুই দিনার ঋণ ছিল, এমতাবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন। এজন্য মহানবী (সা.) স্বয়ং তার জানাযা পড়তে অস্বীকৃতি জানান, তখন অন্য এক সাহাবী জামানত বা নিশ্চয়তা দেন যে, আমি ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি, এরপর মহানবী (সা.) জানাযা পড়ান। এরপর পরের দিন যিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি যে দুই দিনার পরিশোধের দায়িত্ব নিয়েছিলে তা

পরিশোধ করেছো কি? (১৯৯৮ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪০১০৫, হাদীস নং: ১৪৫৯০)

অতএব এই হল, ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব আর এজন্য উৎকণ্ঠা থাকা উচিত। কিন্তু হযরত জাবের (রা.)'র পক্ষ থেকে এই ঘটনাও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'কোন মু'মিন যদি সম্পদ রেখে যায় তাহলে তা তার পরিবার-পরিজন পায় আর কেউ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় আর তার সম্পত্তিও থাকে, আর পরিত্যক্ত সম্পত্তি যদি ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত না হয় অথবা যদি অসহায় সন্তানসন্ততি রেখে যায় তাহলে তার সহায়সম্বলহীন সন্তানসন্ততির দেখাশোনা এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে।'** (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ, হাদীস নং: ২০০৫) অর্থাৎ রাষ্ট্র এটি করবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এটি করবে। এতিমের লালন-পালন এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার জন্য ইসলামে অনেক বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এ কারণেই তিনি (সা.) বলেছেন, এটি সরকারের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই যে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে এর একদিকে তিনি (সা.) এমন ব্যক্তির জানাযা পড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যিনি দুই দিনারের ঋণগ্রস্ত ছিলেন আর অপরদিকে তিনি বলেন, এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মনে হচ্ছে, এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের ঘটনা। প্রথমত যারা অকারণে ঋণ করে তাদের বুঝানোর জন্য যে, ঋণের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে তাই তার প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়ের ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব পালন করা উচিত। অপরদিকে এটিকে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, এতিম শিশুদের লালন-পালন আর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা উচিত। অতএব, এটি হল মহানবী (সা.) প্রদত্ত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এক (নীতিগত) শিক্ষা। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের কীভাবে জনগণের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে প্রজাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি পদদলিত হচ্ছে।

হযরত জাবের (রা.)'র প্রতি মহানবী (সা.)-এর স্নেহ–সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রা.)'র কাছে যাই এবং তাকে বলি, আপনি মহানবী (সা.)-এর কাছে যে কথা শুনেছেন তা বর্ণনা করুন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, এক সফরে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না এটি যুদ্ধের সফর ছিল নাকি উমরার। যাহোক, আমরা মদীনায় ফিরে আসলে মহানবী (সা.) বলেন, যারা তাদের পরিবারের কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চায় তারা ত্বরিৎ যেতে পারে। হযরত জাবের (রা.) বলতেন, এটি শুনে আমরা দ্রুত যাত্রা করি এবং আমি আমার এক উটের ওপর আরোহিত ছিলাম, যার রং ছিল খাকি বা মেটে, কোন দাগ ছিল না। মানুষ আমার পিছনে ছিল। আমি এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমার উট গোঁ ধরে বসে, সামনে এগুতে অস্বীকৃতি জানায়, আমার চালানোর চেষ্টা সত্ত্বেও সেটি পা উঠাচ্ছিল না। এমনটি দেখে মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, জাবের! দৃঢ়ভাবে উটের

পিঠে বস, একথা বলে তিনি (সা.) নিজ চাবুক দ্বারা উটের গায়ে এক বার আঘাত করলে উট নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে হাটতে আরম্ভ করে আর এরপর দ্রুতগতিতে হাটতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, এই উট কি বিক্রি করবে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, বিক্রি করব। আমরা মদীনায় পৌঁছলে মহানবী (সা.) তাঁর কয়েকজন সাহাবীর সাথে মসজিদে প্রবেশ করেন, আমিও সাথে যাই আর এই উটকে মসজিদের সামনে পাথরের মেঝের এক প্রান্তে বেঁধে রাখি এবং তাঁকে বলি, এটি এখন আপনার উট। তিনি (সা.) বাহিরে আসেন আর সেই উটের চর্তুদিকে প্রদক্ষিণ করে বলেন, এটি আমাদের উট। মহানবী (সা.) স্বর্ণের বেশ কয়েকটি অওকিয়া পাঠান এবং বলেন, এগুলো জাবেরকে দিয়ে দাও। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি পুরো মূল্য পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এই মূল্য এবং এই উট উভয়ই তোমার। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং: ২৮৬১) মহানবী (সা.) স্নেহ পরবশ হয়ে উটও তাকে ফেরত দেন আর মূল্যও পরিশোধ করেন।

(এর) একটি কারণ এটিও হতে পারে যে, এক রেওয়ায়েত অনুসারে এই উটটি পানি আনার জন্য ব্যবহৃত হতো। হযরত জাবের (রা.)'র মামা এবং তার আত্মীয়স্বজনরাও এটি ব্যবহার করতেন আর তারা আপত্তিও করেছিল যে, তুমি এটি কেন বিক্রি করলে, এখন আমরা কীভাবে পানি আনব? (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং: ২৯৬৭) যাহোক, এটি ছিল স্বীয় সাহাবীদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর স্নেহ আর যারা বিশেষভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এমন সাহাবীদের সন্তানসন্ততির প্রতিও তিনি (সা.) এই স্নেহ প্রদর্শন করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর সাহাবীদের এই যে বিভিন্ন ঘটনা আমি শুনিয়ে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও তৌফিক দিন, আমরাও যেন তাদের পুণ্যকে নিজেদের জীবনে অবলম্বন করতে পারি।

সংক্ষিপ্ত এই খুতবার পর এখন আমি দু'জন নিষ্ঠাবান প্রয়াত আহমদীর স্মৃতিচারণ করব। প্রথম জন হলেন, সিরিয়া নিবাসী জনাব বেলাল ইদলিবী সাহেব। সম্প্রতি (তিনি) সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এবং ২০১৮ সনের ১৭ই মার্চ রাত দেড়টার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। বেলাল সাহেব ১৯৭৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুমের যখন বয়স ১৭ বছর তখন তার আহমদী ভাই তাকে ডাক্তার মুসাল্লাম দরূবী সাহেবের কোম্পানিতে চাকুরি দেন। সেখানে তিনি জামা'ত এবং আহমদীদের সাথে পরিচিত হন, কিছুকাল পর তিনি বয়আত করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, সিরিয়ায় আমরা ২০১০ থেকে বিভিন্ন আহমদী বাড়িতে নামায আদায় করছিলাম। এ বছর আমরা কাদিয়ান থেকে ফিরে আসার পর আমি সেই দলের সাথে নামায পড়তে আরম্ভ করি যারা বেলাল সাহেবের বাড়িতে নামায পড়ত। তিনি আমার কারণে বয়আত করেছিলেন, এ কারণে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আমাকে স্বাগত জানান। আতিথেয়তার অভ্যাস তার পূর্ব থেকেই ছিল কিন্তু এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যে, আপনার কারণে

আমি আহমদীয়াতের পথ পেয়েছি আর সব সময় তিনি এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, বেলাল সাহেবের স্পোর্টস গার্মেন্টস-এর দোকান ছিল। তিনি সব অভাবী ভাইদের কাপড় দিয়ে সাহায্য করতেন, এমনকি তার দোকানে কাপড় না থাকলে অন্য কোন স্থান থেকে ক্রয় করে সরবরাহ করতেন। খুবই আত্মাভিমানী ছিলেন। কোন আহমদীকে এই অবস্থায় দেখা পছন্দ করতেন না যে, তার কাছে পরিধানের কোন কাপড় থাকবে না বা তার কোন অসচ্ছলতা থাকলে সকল প্রকার অভাব মোচনের চেষ্টা করতেন। নিজের সন্তানসন্ততির প্রতিও খুবই যত্নবান ছিলেন, তাদেরকে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। তিনি বলেন, মরহুমের ইন্তেকালের দু'দিন পূর্বে আমরা তার বাড়িতে নামায পড়ছিলাম, তখন সেক্রেটারী মাল সাহেব বলেন, তিনি ওসীয়্যত, তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের সকল প্রদেয় চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছেন। বরং নতুন যে জমি ক্রয় করেছিলেন তা-ও ওসীয়্যতভুক্ত করেছেন। নিয়মিত চাঁদার হিসাব রাখতেন, চাঁদা প্রদান করতেন, মানব সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, নামায ও ইবাদত সময় মত আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন, খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং প্রতিটি খুতবা শুনতেন, বরং প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, পরের সপ্তাহে আমি যখন খুতবার সারাংশ শুনাতাম তিনি মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করতেন আর সব সময় বলতেন, মনে হয় যেন যুগ–খলীফা আমার সম্পর্কে বা আমাকে সম্বোধন করে কথা বলছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি ১১ বছর বয়স্ক এক পুত্র এবং ১২ বছর বয়স্কা এক কন্যা রেখে গেছেন। জার্মানিতে বসবাসকারী তার বড় ভাই আহমদী। কিন্তু (অপর) দুই ভাই এবং এক বোন আহমদী না। চরম বিরোধিতাও ছিল। তার জানাযার সময়ে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং যে ব্যবস্থা করেছেন তা হল, তার ভাই বলেন, আপনারা অর্থাৎ আহমদীরা জানাযা পড়ে নিন, আমাদের মসজিদে এসেই জানাযা পড়ুন, কোন বাঁধা নেই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেকেই আমাদের পিছনে তার জানাযা পড়েছে।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ সেলিমা মীর সাহেবার, যিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও আব্দুল কাদের ডার সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনিও ২০১৮ সনের ১৭ই মার্চ ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার পিতা ছিলেন গুজরাত জেলার শেখুপুরা নিবাসী সাহাবী মীর এলাহী বখ্শ সাহেব। তিনি ১৯০৪ সনে বয়আত করেছিলেন। সেলিমা মীর সাহেবার মাতা মরিয়ম বেগম সাহেবা কাদিয়ানের 'মহিলা মাদ্রাসায়' পড়াশোনা করেছেন। তার পবিত্র কুরআন পড়ানোর গভীর আগ্রহ ছিল। ১৯৪৬ সনে সেলিমা মীর সাহেবার বিয়ে হয় এবং দেশ বিভাগের পর তিনি করাচি স্থানান্তরিত হন। ১৯৬১ সনে তারা ইরান গমন করেন, সেখানে ৩/৪টি আহমদী পরিবার বসবাস করত, তাদের জন্য জুমুআর নামায এবং সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৪ সনে তার স্বামী ইন্তেকাল করেন এরপর তিনি করাচিতে তার ভাই মীর আমানুল্লাহ্ সাহেবের কাছে চলে যান। আটজন সন্তানের লালন-পালনের পাশাপাশি নিজেও পড়ালেখা আরম্ভ করেন এবং বি.এ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

একই সাথে লাজনা অফিসেও কাজ করতে আরম্ভ করেন। চিঠিপত্রের উত্তর দেয়ার কাজ করেন। এরপর বিভিন্ন পদে তিনি করাচিতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮১ সনে যখন মুনতাযেমা কমিটি গঠিত হয়, হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তাকে মুনতাযেমা কমিটির সভানেত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমাকে যখন এই কমিটির সভানেত্রী নিযুক্তির ঘোষণা দেন তখন আমার অবস্থা ছিল বিস্ময়কর। আমি হতভম্ব হয়ে ভাবছিলাম, এই দায়িত্ব কীভাবে পালন করব? তিনি বলেন, এক দিকে ইমামের আনুগত্য অপর দিকে আমার অযোগ্যতা আর ব্যাপক পরিসরে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকার বিষয়টিও দৃষ্টিপটে ছিল। তিনি বলেন, কাকুতিমিনতির সাথে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে শুরু করি, কাজ আরম্ভ করি, কিছুদিন পর পর মজলিসে আমেলার মিটিং ডাকতে থাকি। বিভিন্ন মজলিস সফর করি আর তাদের সবার সামনে আনুগত্য ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ততা এবং ইসলামী নৈতিক চরিত্র অবলম্বন, বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার, অন্যায় আপত্তি করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার, বিশেষ করে অনেক মহিলার বদভ্যাস হয়ে থাকে, আজকাল পুরুষদের মাঝেও অকারণে ব্যস্থাপনার বিরুদ্ধে আপত্তি করার অনেক বেশি প্রবণতা দেখা যায়। তিনি বলেন, আমাদের মজলিসে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নয়। অধিকহারে এস্তেগফার করার প্রতি বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কেও পত্র লিখতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সুদৃষ্টির ফলে করাচি জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্ উন্নতি করতে আরম্ভ করে। ১৯৬১ সন থেকে তিনি ইরানে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কাজ আরম্ভ করেছিলেন এরপর পাকিস্তানে, অবশেষে ১৯৮৬ সনে করাচির লাজনা ইমাইল্লাহ্ যখন পুনরায় কেন্দ্রীয় লাজনার সাথে যুক্ত হয়, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বই-পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচি তার যুগে অনেক কাজ করেছে। যার মধ্যে ৬০টি বই-পুস্তক এবং দু'টি ম্যাগাজিন তার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে প্রকাশিত হয়েছে। তার যুগে মহিলাদের দাঈ ইলাল্লাহ্ ক্লাসের সূচনা হয়। এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আপনি ভালো কাজ করছেন, হৃদয়ের গভীর থেকে আপনার জন্য দোয়া নির্গত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আপনার আয়ু, স্বাস্থ্য এবং আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন আর আপনার সকল নিষ্ঠাবান সাথিকে ইহ ও পরকালে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।'**

তার কাজের অনেক ঘটনা রয়েছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.), হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তার বিভিন্ন সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এক পত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) লিখেন, আপনার পক্ষ থেকে লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচির রিপোর্ট এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসার বার্তা পৌঁছেছে। আমি অন্তরের

অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের সবার ভালোবাসার আবেগ ও আন্তরিকতার মূল্যায়ন করি আর নিজ প্রভুর দরবারে সর্বদা আপনাদের কল্যাণ কামনা করি আর এই দোয়া করি যে, সেই দিনগুলো পূর্বের চেয়ে অধিক মহিমায় সমৃদ্ধ করে ফেরত দিন যার স্মৃতি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

সেলিমা মীর সাহেবা মাত্র ৩৬ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন কিন্তু তার মেয়ে বলেন, কখনোই কোন অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞতামূলক কথা তার মুখ থেকে শুনি নি। সর্বদা সকল বিষয়ে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, সব সময় ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন আর সন্তান-সন্ততির মাঝেও এটি দেখা পছন্দ করতেন। তার এক মেয়ে বলেন, আমার স্বামী রোগাক্রান্ত হন আর এটি তার অন্তিম ব্যাধি ছিল। তিনি বলেন, আমার মা অর্থাৎ সেলিমা মীর সাহেবা তখন আমার কাছে এসেছিলেন। প্রথম যে জিনিসটি তিনি আমাকে দিয়েছেন তা হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মলফূযাত আর বলেন, আমিও তোমার আব্বার ইন্তেকালের পর মলফূযাতের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছি আর সব কিছু খোদার চরণে সমর্পণ করেছি। তিনি বলতেন, সব ভালোবাসার ওপর খোদার ভালোবাসাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। তার মেয়ে বলেন, আমার স্বামীর যখন অন্তিম মুহূর্ত ছিল, ডাক্তার আমাকে স্বাক্ষর করতে বললে আমি আত্মসংবরণ করতে পারি নি বরং কেঁদে ফেলি। কাঁদতে গিয়ে আমার আওয়াজ উঁচু হয়ে যায় আর আমার মাও তা শুনতে পান। তিনি বলেন, তখন আমি চরম কষ্টে নিপতিত ছিলাম, সেলিমা মীর সাহেবা সেখানে বসেছিলেন, মেয়ের স্বামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, মেয়ে চরম কষ্টে জর্জরিত ছিলেন। তিনি বলেন, হাসপাতাল থেকে যাওয়ার সময় আমি মায়ের কাছে একটু দাঁড়াই (অর্থাৎ সেলিমা মীর সাহেবার কাছে) কিন্তু আম্মা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, তুমি আমার মেয়ে! আমার মেয়ে এত অধৈর্য হতে পারে না, তোমার কান্নার আওয়াজ কেন এত উঁচু হল? আরো বলেন, চরম দুঃখের মুহূর্তে ধৈর্য ধরাই প্রকৃত ধৈর্য, এরপর সবারই ধৈর্য এসে যায়। তিনি বলেন, আমাকে তিনি উপদেশ দেন যে, তোমার স্বামী খোদার আমানত ছিল, তিনি দিয়েছিলেন, তাঁর জিনিস তিনিই ফেরত নিয়েছেন।

চার কন্যার পর (তার) প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং কিছুদিন পর সে মারা যায়। পরম ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়ে বলতেন, আল্লাহ্‌র আমানত ছিল যা তিনি ফেরত নিয়েছেন। সব সময় দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। সন্তানরা বলেন, সব সময় এই উপদেশ দিতে গিয়ে পাঞ্জাবীতে বলতেন, **'খলীফা দা লাড় নেহি ছাডনা'** অর্থাৎ খলীফার আঁচল কখনো ছাড়বে না, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। পর্দার বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। পর্দার ক্ষেত্রে যেখানেই কোন দুর্বলতা দেখতেন খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন যেন অন্যের মনে আঘাত না লাগে। মরহুমার এক মেয়ে লিখেন, আমার ছোট বোনের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে, ছেলে বলে প্রথমে আমি মেয়ে দেখব, এরপর কথা আগাবে। তিনি বলেন, আমরা আম্মাকে বললাম, কনেকে নেকাবের পরিবর্তে স্কার্ফ পরিয়ে সামনে

নিয়ে যাই। নিজের মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছিল। তিনি বলেন, তখন মা তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, বিয়ে হোক বা না হোক, নেকাব ছাড়া সে সামনে যাবে না। তার এক মেয়ের ড্রাইভিং টেস্ট ছিল লন্ডনে আর ইন্সট্রাক্টর ছিল পুরুষ। তাই তিনি সেই মেয়ের সাথে বেরিয়ে পড়েন যে, আমি কোন পুরুষের সাথে তোমাকে একা যেতে দিব না। অনেকেই হাসি-তামাশাও করেছে কিন্তু তিনি মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। মাথায় স্কার্ফ বা নেকাব নেয়ার জন্য সব সময় বলতেন। খলীফাদের উক্তিভিত্তিক লাজনার একটি বইয়ের নাম হল, **'ঊড়নী ওয়ালীওঁ কে লিয়ে ফুল'**। তিনি বলতেন, যদি ফুল নিতে হয় তাহলে ওড়না পড়তে হবে। ফুল তার জন্য যে পর্দা করে। তার এক দৌহিত্রী বলেন, আমার যখন বিয়ে হতে যাচ্ছিল তখন হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবার একটি পুস্তক থেকে মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কৃত নসীহতকে আন্ডার লাইন করে আমাকে দেন আর বলেন, এগুলো বার বার পড়।

তিনি আরো বলেন, গভীর রাত পর্যন্ত অবিবাহিত মেয়েদের কোন অনুষ্ঠানে থাকা তার পছন্দ ছিল না। কলেজের যুগে আমাদের বান্ধবীদের বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে তিনি নিজে সাথে যেতেন।

আজকালও অনেক মেয়ে অনুষ্ঠানে রাত অতিবাহিত করার জন্য (অনুমতি চেয়ে) লিখে। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রীতি, আমাদের মেয়েদের এসব এড়িয়ে চলা উচিত।

তিনি বলেন, আমাদের ফজরের নামায বাদ পড়লে সারা দিন আমাদের সাথে কথা বলতেন না, এটি অনেক বড় শাস্তি হতো আমাদের জন্য। একবার আমেরিকার শিকাগোয় এসেছিলেন, এক অনুষ্ঠানে কোন মহিলা মিউজিক ছেড়ে নর্তকীর ভঙ্গীতে উঠতে গেলেই তিনি পিছন দিক থেকে তাকে ধরে ফেলেন এবং বলেন, মিউজিক বন্ধ কর, তুমি কি জান না নর্তকীদের কি বলা হয়?

একটি খ্রিষ্টান মেয়েকে লালন-পালন করেছেন, তাকে বিভিন্ন দোয়া শিখিয়েছেন, চারিত্রিক গুণাবলীর বিভিন্ন কথা শিখিয়েছেন, সেই মেয়ে বলতো, আমি তো অর্ধেক আহমদী হয়ে গেছি।

আমাতুল বারী নাসের সাহেবা বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপা সেলিমা মীর সাহেবার কাছ থেকে করাচি লাজনার জন্য দীর্ঘদিন সেবা নিয়েছেন। তিনি এ পৃথিবীতে নেই কিন্তু তার সুশিক্ষায় সুশিক্ষিতা সদস্যরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে লাজনার কাজ করতে থাকবে এবং তার নাম ও কাজকে জীবিত রাখবে। তার নাম উত্তম কার্যক্রমের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। সব সময় তিনি তত্ত্বাবধান করতেন, কাজ শিখাতেন, নিজের নাম প্রকাশের কোন বাসনা তার ছিল না বরং তার বাসনা এটিই ছিল যে, তার সহকর্মীরা যেন কোনভাবে কাজ শিখে যায়। বই পুস্তক যখন ছেপেছে তখনও তিনি তার টিমকে গভীরভাবে উৎসাহিত করেছেন।

শেষ বয়সে প্রায়শ দেশের বাইরে যেতে হতো, জামা'তের কাজ যাতে প্রভাবিত না হয় এই মানসে নিজেই কেন্দ্রে আবেদন করে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট অনুমোদন নেন আর খুবই সুন্দরভাবে একটি মিটিং ডেকে তাকে ফুলের মালা পরিয়ে দেন। এরপর মিসেস ভাট্টি সাহেবাকে প্রেসিডেন্ট-এর চেয়ারে বসিয়ে তার সেবা সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন, আনুগত্যের উপদেশ দেন আর গাম্ভীর্যের সাথে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। তিনি বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের এটিও একটি রীতি হয়ে থাকে।

অতএব এমন মানুষ যারা কোন সময় তাদেরকে জামাতি দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হলে বা তাদের অনূকুলে অনুমোদন দেয়া না হলে অনেক আপত্তি করতে আরম্ভ করে, তাদের জন্য এতে শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যদি দায়িত্ব পেলে আলহামদুলিল্লাহ্, দায়িত্ব না পেলেও খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন আর কাজ করার বা জামা'তের সেবার জন্য অন্যান্য পন্থা সন্ধান করুন। কেবল পদ পেলেই জামা'তের কাজ হবে এমনটি আবশ্যক নয়।

তিনি আরো বলেন, সব কাজ অবস্থা বুঝে-শুনে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে করতেন। তাকে হৃদয়ের কথা বলে কখনও আশঙ্কা থাকতো না যে, কথা প্রকাশ পেয়ে যাবে, (মানুষের) গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেন। আমাতুল বারী নাসের সাহেবা আরো লিখেন, জানি না কীভাবে তিনি সবার গোপন কথা হৃদয়ে গোপন রাখতেন। এটি অনেক বড় বিশেষত্ব যার ঘাটতি আজকাল পুরুষদের মাঝেও দেখা যায়।

করাচি থেকে আমাতুন নুর সাহেবা লিখেন, সেলিমা মীর সাহেবা পরম স্নেহশীলা, নিঃস্বার্থ, অত্যন্ত বিনয়ী, নিজে পিছনে থেকে অন্যের কাজের অশেষ প্রশংসাকারিনী এবং সদা হাস্যমুখের অধিকারীনি ছিলেন, একটি সুন্দর চেহারার পাশাপাশি খোদা তা'লা তাকে সুন্দর এবং কোমল হৃদয়ও দান করেছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করার পর আমি বললাম, এলাকা অনেক বিস্তৃত আর আমার অভিজ্ঞতাও নেই এবং আমার কাছে বাহনও নেই। তিনি বলেন, কোন অসুবিধা নেই, তোমার (বাড়ির) কাছেই আমার মেয়ে বসবাস করে, যখনই সফরে যেতে হয় তাকে বলো, সে গাড়ি সরবরাহ করবে বা আমাকে জানিও, আমি আমার গাড়ি পাঠিয়ে দিব, কোন প্রকার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। পরম বিনয় ছিল তার মাঝে, তিনি কর্মীদের সাথে বসে স্বয়ং কাজ করাতেন।

করাচির সেক্রেটারী এশায়াত লিখেন, আপা সেলিমা মীর সাহেবার সাথে ১৯৮৬ সন থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। আমি তাকে গরীবদের লালনকারী এবং অত্যন্ত বিনয়ী পেয়েছি। একবার করাচির একজন আন্তরিক উৎসাহী কর্মী মহিলা কোন কারণে জামা'ত থেকে পিছিয়ে গিয়েছিল। তার সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ এবং তার কাছে জামা'তের কিছু বিরল মূল্যবান জিনিসপত্র ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)'র দোয়া এবং দিক নির্দেশনায় আপা সেলিমা সাহেবার তত্ত্বাবধানে খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে তার সাথে যোগাযোগ করা হয় কিন্তু কিছু হস্তগত হওয়ার পূর্বেই

তিনি ইন্তেকাল করেন। তার কোন আত্মীয়কে তিনি বলেন, এই ধরনের কোন জিনিস আপনার কাছে থাকলে আমরা মূল্য পরিশোধ করে তা নেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি, আমাদেরকে দিয়ে দিন কেননা, এগুলো জামা'তের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিস এবং মসীহ্ মওউদ এর বিভিন্ন তাবাররুকাত ছিল। এরপর আমাদের একটি সিন্দুক হস্তগত হয়, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে লেখা চিঠি-পত্র এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর রচনাবলী ছিল। আর সিন্দুকটিও ছিল ঐতিহাসিক। অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তিনি সেটি হস্তগত করেন। আর পিছিয়ে যাওয়া সেই ভদ্র মহিলার চিকিৎসাও তিনি করিয়েছিলেন।

যারা পত্র লিখেছেন তাদের সবাই এটি উল্লেখ করেছেন যে, খুবই গাম্ভির্যপূর্ণ, প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারীনি, ধৈর্যশীলা, উন্নত নৈতিক চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহতকারীনি, পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, পুণ্যের উপদেশদাত্রী ছিলেন। আপন-পর সবাইকে তিনি একইভাবে নসীহত করতেন। এমন নয় যে, নিজের কন্যাদের বাদ দিবেন, বরং নিজের কন্যাদেরও তিনি হিতোপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর তার ভরসা ছিল দর্শনীয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সর্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানসন্ততি, তার কন্যাদেরকেও তার পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন) জুমুআর নামাযের পর আমি উভয়েরই গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)